এদেশে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বন্দ্ব যখন চরমে উঠেছে, যখন সরকারী শিক্ষানীতি বলতে প্রায় কিছুই ছিল না, সে সময় স্কটল্যাণ্ডের ডমফলিনশায়ারের অধিবাসী মিশনারী পাদ্রী রেভারেণ্ড উইলিয়ম এ্যাডাম তৎকালীন শিক্ষা সমস্যা সমাধানের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষা সমস্যা সমাধানের উপযোগী তাঁর বাস্তব বুদ্ধি ছিল। তিনি বুঝেছিলেন নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হলে পুরাতন ব্যবস্থা বা দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। নইলে নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে পারবে না। মিঃ এ্যাডাম ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মিশনারীরূপে ভারতবর্ষে আসেন। কিছুদিন শ্রীরামপুরের মিশনারীদের সঙ্গে কাজ করেন। রামমোহন রায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি ১৮১২ খৃষ্টাব্দে একেশ্বরবাদী হয়ে মিশন পরিত্যাগ করেন এবং সাংবাদিকরূপে এদেশের জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বাংলাদেশের গ্রাম্য শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য তিনি ১৮২৯ ও ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে দুবার লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি দু'বার প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তৃতীয়বার প্রস্তাব করেন এবং সমীক্ষার অনুমতি পান। তখনকার বাংলাদেশ বলতে বোঝাত পূর্ববাংলা, পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার কিছু অংশ। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বছর বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে এ্যাডাম পর পর তিনটি শিক্ষা বিবরণী দাখিল করেন। ১৮৩৫ খৃঃ তথ্যভিত্তিক দুটি বিবরণ এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তথ্য ও সুপারিশ সম্বলিত আর একটি বিবরণ সরকারের কাছে পেশ করেন। তাঁর মোট এই তিনটি বিবরণ ইতিহাসে এ্যাডামের রিপোর্ট (Adam's Report) নামে খ্যাত হয়ে আছে। এই বিবরণীগুলি হল সে যুগের দেশীয় শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যলিপি।

- **প্রথম বিবরণী :** ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তিনি প্রথম বিবরণীটি দাখিল করেন। প্রথমটির তথ্য পূর্বেকার বিভিন্ন নথিপত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছিল।

এই বিবরণীতে এ্যাডাম দাবী করেন যে তখনকার বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল একলক্ষ অর্থাৎ প্রতি চারশত জনের একটি করে বিদ্যালয় ছিল। এ্যাডাম 'স্কুল' বলতে আধুনিক ধরনের সুসংগঠিত স্কুলকে বোঝাননি। তৎকালে সমষ্টিগতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে যত রকমের শিক্ষাচর্চার আয়োজন ছিল তিনি সবগুলিকে 'স্কুল' নামে অভিহিত করেছেন।

● **দ্বিতীয় বিবরণী ঃ** এ্যাডাম দ্বিতীয় বিবরণীটি দাখিল করেন ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে ডিসেম্বর। এই বিবরণীতে রাজশাহী জেলার নাটোর থানার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বিবরণীতে রাজশাহী জেলার নাটোর থানার ৪৮৫টি গ্রামে ২৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৬২। এছাড়া ২৩৮ টি গ্রামের ১৫২৮ টি পারিবারিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা ছিল। তিনি বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা — প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা ছিল পাঠশালা, মক্তব, গৃহস্থ বাড়ির বিদ্যালয়, নারী শিক্ষালয়, বয়স্ক বিদ্যালয় ও ইংরোজী বিদ্যালয় প্রভৃতি। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন অতি নগণ্য ছিল। ভাষার মাধ্যমও ছিল নানা রকমের। উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল টোল ও মাদ্রাসা। নাটোর থানা অঞ্চলে তিনি ৩৮টি সংস্কৃত টোলের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাদের শিক্ষা, খাওয়া থাকার জন্য কোন অর্থ লাগত না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাসিক গড় বেতন ছিল সাড়ে পাঁচ টাকা।

● **তৃতীয় বিবরণী (Thrid Report) ঃ** ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তথ্য ও সুপারিশ সম্বলিত তৃতীয় বিবরণী সরকারের কাছে পেশ করেন। বিবরণীটি বিশেষ মূল্যবান ও উল্লেখযোগ্য। এই বিবরণীতে এ্যাডাম বাংলা ও বিহারের শিক্ষা ব্যবস্থার বিবরণ ও পরিসংখ্যানমূলক হিসাব দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় রিপোর্টের শেষ অংশে মিঃ এ্যাডাম তাঁর নিজ মন্তব্য ও পরিকল্পনা নিবদ্ধ করেছেন। উক্ত পাঁচটি জেলার প্রতিটিতে মাত্র একটি করে থানার কাছে এ্যাডাম নিজে সংগ্রহ করেছিলেন, অন্যগুলিতে তাঁর সহকর্মীরা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ফলে পরিসংখ্যানগত কিছু ত্রুটি হয়ত রয়ে গেছে। কারণ তথ্য সংগ্রাহকগণ সব সময়ে বিশ্বস্তভাবে কাজ করেননি বলে সব বিদ্যালয়ের খবর পাওয়া যায়নি। অনেক সময় সরকারী কর্মচারীর প্রতি অবিশ্বাস বশতঃ স্থানীয় লোকেরা অনেক কথা গোপন করেছে। তা সত্ত্বেও তাঁর তৃতীয় বিবরণীটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি তথ্য সংগ্রহ করার পর সেগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে কি করে বাঁচিয়ে তুলে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি রূপে দাঁড় করানো যায়, সে সম্পর্কে কয়েকটি সুপারিশ করেছেন।

ঐ বিবরণীতে উপরোক্ত ৫ টি জেলায় ২৫৬৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০,৯১৫ জন পাঠ গ্রহণ করত। সে যুগে উচ্চ ও প্রাথমিক এই দুই শ্রেণীর দেশীয় বিদ্যালয় ছিল।

❒ **(১) পাঠশালা ও মক্তব ঃ** পাঠশালা ও মক্তব ছিল প্রাথমিক শিক্ষালয়। মক্তব ছিল মসজিদ সংলগ্ন মুসলিম প্রতিষ্ঠান। আর পাঠশালা ছিল ধর্ম নিরপেক্ষ প্রাথমিক শিক্ষালয়। এক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম ছিল মূলতঃ লিখন, পঠন ও ব্যবহারিক

গণিত। মক্তবে কোরাণ শরিফের দু-চারটি বয়েতও মুখস্থ করান হত। একজন গুরুমশায় পাঠশালা গঠন করতেন এবং তিনিই তার সমূহ দায়িত্ব বহন করতেন। ছাত্রসংখ্যা হতো মাত্র ২/৩ টি থেকে ১৪/১৫ টি। বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা ছিল অতি নগণ্য।

❐ **(২) প্রাথমিক শিক্ষার মান ঃ** পাঠশালাগুলির অধিকাংশই নিজস্ব ঘরবাড়ী ছিল। মন্দির, মসজিদের চত্বরে, চণ্ডীমণ্ডপে, বিত্তবান ব্যক্তির কাছারি ঘরে, মুদির দোকানে এমন কি গাছতলাতে বিদ্যালয় বসতো। পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা, বিদ্যালয়ের নির্ঘন্ট কোন কিছুরই নির্দিষ্টতা ছিল না। পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা গুরুমশায়ের ইচ্ছামত নির্ধারিত হত। বিদ্যালয়ের কোন শ্রেণীবিভাগ ছিল না। শিক্ষা পদ্ধতিও ছিল প্রাচীন। একটি বিদ্যালয়ে একাধিক শিক্ষকও ছিলেন না। তবে সর্দার পড়ো (Monitorial System) প্রচলিত ছিল। সর্দার পড়োরা গুরুমশায়কে শিক্ষাদান কার্যে সহায়তা করতো। কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থাই ছিল শিক্ষাকার্যের প্রধান সহায়ক। শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল সামান্যই। গুরুমশায়ের আর্থিক সমস্যার সমাধান করে বিদ্যালয় চালাতে হত। শিক্ষার্থীরা অর্থ বা বস্তুর বিনিময়ে শিক্ষালাভ করতো।

❐ **(৩) প্রাথমিক শিক্ষার অবদান ঃ** এত দৈন্য দশা, পাঠ্যক্রমে সীমাবদ্ধতা ও নানা ত্রুটি সত্ত্বেও গণশিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অবদান ছিল অনস্বীকার্য এবং এই শিক্ষা ব্যবস্থায় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট মূল্য ছিল। তখনকার ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী শিক্ষাদানে প্রাথমিক দেশীয় শিক্ষালয়গুলি যথেষ্ট সক্ষম ছিল। কৃষক, তালুকদার, বেনে, ব্যবসাদারের বাস্তব প্রয়োজন মিটতো বলেই সাধারণ সমাজে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জনপ্রিয়তা ছিল এবং অসীম প্রাণশক্তি অর্জন করতে পেরেছিল।

❐ **(৪) মাদ্রাসা ও টোল ঃ** উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে হিন্দুদের টোল ও মুসলমানদের মাদ্রাসা প্রচলিত ছিল। পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী টোল তিন ধরণের ছিল। শিক্ষকরা ছিলেন ব্রাহ্মণ, অধিকাংশ ছাত্র ছিল ব্রাহ্মণ সন্তান। টোলগুলি নারী বর্জিত ছিল। শিক্ষার ভাষা মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। টোলের উদ্দেশ্য ছিল পণ্ডিত তৈরী করা। বিদ্যালয়ের আবহাওয়া ছিল ধর্ম প্রভাবিত। টোলের শিক্ষা ছিল উচ্চমানের।

মাদ্রাসাগুলি বসত সাধারণতঃ মসজিদে। ভাষার মাধ্যম ছিল আরবী ও ফারসী। মাদ্রাসার অধ্যাপকগণ মুসলমানই হতেন। এসব বিদ্যালয়ে তৈরী হতেন মৌলভীবর্গ। ফারসী ছিল তখনকার সরকারী ভাষা। তাই অনেক হিন্দু ছাত্রও ফারসী পড়তেন। ফারসী শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন হিন্দুও শিক্ষকতা করতেন। ধনী মুসলমানদের ক্ষেত্রে 'আখেনজি' রেখে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। টোল ও মাদ্রাসাগুলি জমিদারবর্গ, ধনী ব্যক্তির দানে ও নিষ্কর ভূমির আয়ের উপর নির্ভর করে পরিচালিত হত। অতি অল্প সংখ্যক লোকই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করত।

❐ **(৫) লিখন-পঠনক্ষমের হার ঃ** এ্যাডামের বিবরণীতে তখনকার বাংলাদেশের লিখন পঠনক্ষম ব্যক্তিদের একটি তথ্যপূর্ণ পরিসংখ্যান (Statistics)

দিয়েছেন। এই তথ্য সম্পর্কে Sir Philip Hartog মন্তব্য করেছেন, 'The first systematic census of literacy in India.' এই পরিসংখ্যানে এ্যাডাম শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ৬টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা- (১) উচ্চশিক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষক, (২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, (৩) অশিক্ষক বুদ্ধিজীবী, (৪) প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, (৬) শুধু নিজের নাম স্বাক্ষর করতে পারেন এমন ব্যক্তি।

❑ **(৬) এ্যাডামের মন্তব্য ঃ** তৃতীয় রিপোর্টের শেষ অংশে এ্যাডাম তার নিজ মন্তব্য ও পরিকল্পনা পরিবেশন করেছেন। তিনি শিক্ষার 'চুঁইয়ে নামার' নীতির (downward filtration theory) বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর মতে এই নীতিতে দেশজ শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, যে শিক্ষার দ্বারা পুরুষানুক্রমে ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের চরিত্র গঠিত হয়ে এসেছে, সেই ব্যবস্থাকে অবহেলা করা অন্যায় ও অদুরদর্শিতার পরিচয়। ব্যক্তির শিক্ষা শুরু হয় গোড়া থেকে, বর্ণ পরিচয়ের জন্য লোকে প্রথমে কলেজে যায় না। কোন প্রাসাদকে দৃঢ় ও উচ্চ করতে হলে তার ভিত্তি প্রশস্ত ও গভীর করা দরকার। শিক্ষার সর্বনিম্ন স্তর থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক স্তরের সঙ্গে পারস্পরিক সম্বন্ধ রচনা করতে পারলেই সাফল্য লাভ হবে।

এ্যাডাম এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, 'দেশজ শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসোন্মুখ এবং বেশ কিছুদিন ধরে এই অবস্থা চলে এসেছে'। এই শিক্ষা ব্যবস্থা স্থিতিশীল, প্রগতিশীল, ক্ষয়শীল যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তার উপরেই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে হবে। "To whatever extent such institutions may exist and in whatever condition they may be found stationary, advancing or retrograding, they present the only true and sure foundations on which any scheme of general or national education can be established." এ্যাডাম বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষে জনশিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য দীর্ঘকালের অবহেলিত দেশীয় বিদ্যালয়গুলিকে অগ্রাহ্য না করে বরং তাদের সংস্কারের দিকে বিশেষভাবে মন দিতে হবে। তিনি অনুভব করেছিলেন যে এসব দেশের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলির যথার্থ পুনরুজ্জীবন করতে পারলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত উন্নতি হবে। কারণ ঐ বিদ্যালয়গুলি দেশের রাজনীতি, প্রথা ও ঐতিহ্যের উপযোগী, দেশীয় বিদ্যালয়গুলির বাস্তবমুখী ব্যবহারিক শিক্ষা জনজীবনে বিশেষ কার্যকর ছিল। এ্যাডাম বলেন যে, এগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারলে শিক্ষা ব্যবস্থা জনপ্রিয় হবে, অর্থের সাশ্রয় হবে, অতি অল্প সময়ে সাফল্য আসবে।

❑ **(৭) এ্যাডামের সুপারিশ ঃ** এ্যাডাম লিখেছেন যে বিদ্যালয়গুলির মানের নিম্নতার জন্য এগুলির আগে সংস্কার করা দরকার, তবেই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। এজন্য তিনি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশসহ একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। তাঁর পরিকল্পনার প্রধান বক্তব্যগুলি হল, যথা -

● (১) প্রথমে এক বা একাধিক জেলাকে নির্বাচিত করে তথাকার শিক্ষা ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

● (২) প্রাথমিক শিক্ষার ছাত্র ও শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর উপযোগী বাংলা, হিন্দী ও উর্দু পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত করতে হবে।

● (৩) প্রত্যেক জেলায় শিক্ষা পরিকল্পনার সুষ্ঠ রূপায়নের জন্য একজন পরীক্ষক (Examiner) নিযুক্ত করতে হবে। তিনি তদন্তের অনুষ্ঠান করবেন, শিক্ষকদের পাঠ্য পুস্তকগুলির ব্যবহার বুঝিয়ে দেবেন, পরীক্ষা পরিচালনা ও পুরস্কার বিতরণ করবেন এবং পরিকল্পনা প্রয়োগের জন্য দায়ী থাকবেন।

● (৪) শিক্ষকদের মধ্যে পুস্তক বিতরণ করে সেগুলি তাঁদের পড়তে ও পড়াতে উৎসাহিত করতে হবে।

● (৫) শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য আদর্শ 'নর্মাল স্কুল' স্থাপন করতে হবে। সেখানে বছরে দু'তিন মাস করে চার বছরে তাঁদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে।

● (৬) শিক্ষকরা যাতে তাঁদের নবলব্ধ জ্ঞান ছাত্রদের প্রদান করেন, এজন্য উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষকগণ ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন এবং বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করবেন।

● (৭) গুরুমশায়দের গ্রামে বসবাসে প্রলুব্ধ করতে সরকার বিদ্যালয়গুলির জন্য ভূমিদান করবেন।

□ **এ্যাডামের বিবরণের পরিণতি ঃ** এ্যাডামকে শিক্ষা সমীক্ষার অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা না করেই তৎকালীন বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নীতিতে জনশিক্ষার প্রতি সরকারী দায়িত্বের কোন উল্লেখ ছিল না। এ্যাডামের বিবরণ বিচার বিবেচনার কোন সুযোগই লাভ করেনি। ফলে এ্যাডামের রিপোর্ট হয়ে রইল সরকারী দপ্তরখানায় শুধু একটি ইতিহাসের দলিল। পরবর্তীকালে প্রায় একশত বছর পরে Sir Philip Hartog এ্যাডামের পরিবেশিত রিপোর্টে বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র সংখ্যা, শিক্ষার হার ইত্যাদি তথ্যকে 'কল্পনাশ্রয়ী রূপকথা' বা 'কল্পিত অত্যুক্তিপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন। হার্টগ লিখেন যে এ্যাডামের উল্লিখিত এক লক্ষ বিদ্যালয়ের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ভারতের অনেক শিক্ষাবিদ্ হার্টগের ওই সমালোচনাপূর্ণ উক্তির প্রতিবাদ করেছেন। R.D. Parulekar এবং M.R. Paranjape এ্যাডামের হিসাব নির্ভুল বলে দাবী করেন। ইংলণ্ডের গোল টেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী এ্যাডামের তথ্য উল্লেখ করে বলেন যে, ইংরেজের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ১৫০ বছরে ভারতবর্ষে শিক্ষার অধঃপতনই ঘটেছে।

এ্যাডামের রিপোর্ট অগ্রাহ্য করার ফলে গণশিক্ষার উপর সুদূর প্রসারী বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। একটি স্বাভাবিক গণশিক্ষার মৃত্যু হল। ফলে দীর্ঘকাল দেশের জন সাধারণ শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত ছিল। যদি এ্যাডামের রিপোর্ট তখন গ্রহণ

করা হত, তাহলে ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভের সুদীর্ঘ দিন পরেও অজ্ঞানের সেই তিমিরে থাকত না, বর্তমানকালে প্রাথমিক শিক্ষার বহু সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হত, নিরক্ষরতার এত ব্যাপক প্রসার হত না, প্রাথমিক শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থা হত না।

❒ **মূল্যায়ন ঃ** তৎকালীন সরকারের দ্বারা এ্যাডামের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যাত হলেও পরবর্তীকালের শিক্ষা ব্যবস্থায় তাঁর পরিকল্পনা ও সুপারিশের প্রভাব অনেক পরিমাণে প্রতিফলিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাঁর সুপারিশগুলিকে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। সে কারণে এ্যাডামের বিবরণ আংশিক ভাবে সাফল্য লাভ করেছিল বলা যেতে পারে। এ্যাডামের সংখ্যানুপাতিক হিসাবে যাই হোক, তিনি তাঁর রিপোর্টে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার এক অতি বাস্তব অথচ মর্মস্পর্শী চিত্র তুলে ধরেছিলেন। তাঁর বিবরণীতে সর্বপ্রথম এক জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছিল, জন শিক্ষার দাবী স্বীকৃতি লাভ করেছিল, জাতীয় ঐতিহ্য বজায় রেখে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছিল।